

কৃষি কাজে বিজ্ঞান

ভূমিকা : একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে চোখ রাখলে আশ্চর্য হতে হয়। কেননা বিজ্ঞান তার নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে এ পৃথিবীকে আজ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত সাধন করেছে, যা আজ এক অপরিণত বালকের কাছে স্পষ্ট। বিজ্ঞান ছাড়া আজকের পৃথিবীতে উন্নতির কথা চিন্তাই করা যায় না। একেবারে সহজ-সরল কথায় বলতে গেলে আমরা বুঝি যে, বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ, বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ছোঁয়ায় যেসব শিল্প বা প্রতিষ্ঠান ধন্য হয়েছে আজকের কৃষি তার কোনো অংশেই কম নয়। বরং পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে আজকের কৃষি যে রূপ লাভ করেছে তার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান।

অতীতের কথা : আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে কৃষি অথবা কৃষকের কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। মানুষ ফলমূল ও মাছ স্বীকার করে এবং জন্তু-জানোয়ারের মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। কিন্তু একপর্যায়ে মানুষ পশুপালন ও বীজ বপন করতে শেখে। মানুষ তখন থেকেই সমাজবদ্ধ হতে শুরু করে। একদল মন দেয় কৃষি কাজে, অন্য দল মন দেয় ব্যবসা বাণিজ্যে। এভাবে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে।

বাংলাদেশের অবস্থান : বাংলাদেশ হলো কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৮৫ জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। দুঃখের বিষয় হলো এ কথা সত্য যে এখনো এদেশের কৃষক সেই চিরাচরিত সনাতন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে চলছে। তখন আমাদের দেশের কৃষকরা সেই গতানুগতিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করছে। সেই পুরনো পদ্ধতির লাঙ্গল ও একজোড়া গরু

এখনো কৃষি ব্যবস্থায় প্রধান হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে শস্য উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছে না।

কৃষির সূচনা : যেদিন থেকে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখলো, যেদিন সে পাথরের অস্ত্র নিয়ে বন্য পশুর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করল, যেদিন সে চাকা তৈরি করল, মূলত সেদিন থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হলো। মানুষ যেদিন আবিষ্কার করল অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় তার ক্ষুদ্র অবয়বে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম অথচ প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মস্তিষ্ক, সেদিন থেকেই প্রকৃতির রহস্য ভেদ করার জন্য নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করল সে। প্রকৃতিকে আবিষ্কার করার নেশায় হয়ে উঠলো সে অস্থির। প্রকৃতির দেওয়া শস্য সম্পদে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। সে কৃষিশিক্ষা অর্জন করে নিজের রুচির পরিভূষ্টি ও পরিপূষ্টি সাধনে আত্মনিয়োজিত হলো।

কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর পেরিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে গরু কিংবা মহিষ দ্বারা লাঙ্গল চালিয়ে কৃষিকাজ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে গরুর লাঙ্গলের পরিবর্তে এসেছে কলের লাঙ্গল, ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার। এতে একদিকে যেমন শ্রমিকের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে তেমনি জমিও কর্ষিত হচ্ছে গভীরভাবে। যার ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। জলসেচ ব্যবস্থা, উন্নত বীজ, সরবরাহ, ভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি কৃষিতে বিজ্ঞানেরই অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সে অনুপাতে আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে মানুষের অল্প সংগ্রহের প্রয়াস বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে জরুরী কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। আর এজন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে দিন দিন খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলছে।

উন্নত দেশগুলোর কৃষি ব্যবস্থাপনা : উন্নত দেশসমূহের কৃষিকাজ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জমি কর্ষণ, বীজ বপন, সেচকাজ; ফসল কাটা, মাড়াই, বাছাই ইত্যাদি কাজ আজ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়। ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ করে মেশিন দিয়ে জমিতে বীজ বপন করা হয়। তার আগে বপনের জন্য সংরক্ষিত বীজ বাছাই কাজও যন্ত্র দ্বারা করা হয়। বর্তমান যুগে মানুষ গভীর নলকূপ এবং পাম্পের সাহায্যে জমিতে সেচ দেয়। সব উন্নত দেশ আজ কৃষিকে যান্ত্রিক করে তুলেছে। শীত প্রধান দেশগুলো গ্রিনহাউজের সাহায্যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন করছে। বিজ্ঞানের দ্বারা বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতেও সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো হচ্ছে। সর্বোপরি বিজ্ঞান কৃষিকার্যে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রভাব : আমাদের দেশেও আজ কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টরের ব্যবহার করা যাচ্ছে না জমির খন্ড-বিখন্ডতার কারণে। সেচ কাজে মানুষ এখন বৃষ্টি জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। এখন সেচের জন্য ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ, পাম্প ইত্যাদি। উন্নত ধরনের বীজ সংরক্ষণে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। খেতে পোকাকার আক্রমণ হলে তা দমনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসলের ফলন বাড়ানো হচ্ছে। জমিতে আগে যেখানে এক ফসল হতো, বিজ্ঞানের অবদানে এখন সেখানে তিন ফসল পর্যন্ত হয়। আমাদের দেশের কৃষি কাজকে এখনো পুরোপুরি যান্ত্রিক করা যায়নি। বিজ্ঞানের অবদানকে দেশের চাষাবাদের ক্ষেত্রে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে।

বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ সমস্যা এবং বাংলাদেশ : কৃষকেরা অর্থাভাবে হালের গরু বিক্রি করে, দিনমজুরি করে, অতিকষ্টে অন্ন সংস্থান করে। তারা দরিদ্র বলে অর্থ ব্যয় করে চাষাবাদের উপযোগী আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে না। বর্তমানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্লোগান শোনা যাচ্ছে, “অধিক খাদ্য ফলাও”— এ আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করা সম্ভব, যদি কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যাতে কম মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের হাতে পৌঁছে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি আমরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারছি না কৃষকের অজ্ঞতার ফলে। এ থেকে উত্তরণের জন্য প্রথমে দেশে শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আশার কথা, বর্তমানে সরকার ও বিভিন্ন এনজিও গ্রাম্য যুবকদের কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা : মানুষ যখন প্রথমে আগুন জ্বালাত, পাথরের অস্ত্র নিয়ে বন্য পশুর সাথে যুদ্ধ করত, ঢাকা গড়াতে শিখেছিল, তখন থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতিকে আবিষ্কার করার নেশায় মানুষ অস্থির হয়ে উঠলো। কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। তাই প্রকৃতি থেকে আহৃত শস্য-সম্পদে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। সে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে নিজের রুচির পরিতৃপ্তি ও পরিপূষ্টি করেছে।

শিল্পবিপ্লব ও কৃষি : প্রস্তরযুগের শেষ দিক থেকে কৃষিকাজের সূচনা। আদিম যুগে যে পরিশ্রমে মানুষ এক একর জমি চাষ করত, ২ শতাব্দী আগে সে পরিশ্রমে চাষ হয়েছে ৫০ একর জমি আর আজ ঠিক একই পরিমাণ শ্রমের বিনিময়ে এক হাজার একর জমি চাষ করা সম্ভব। এজন্য অতীতের চাষাবাদ পদ্ধতি বাদ দিয়ে মানুষ বেছে নিয়েছে আধুনিক পদ্ধতি। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং

উনিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিল্পবিপ্লব কৃষিকার্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

কৃষিযন্ত্র ও সুবিধা : অসংখ্য নিড়ানি সমন্বিত এক একটি কৃষিযন্ত্র চাষাবাদের জন্য জমি তৈরিতে মানুষকে বিপুল সাহায্য করেছে। নানা ধরনের আধুনিক কৃষিযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে চাষাবাদের ক্ষেত্রে যেমন যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে, তেমনি কৃষকরা ভোগ করেছে নানা সুবিধা।

মিলকার, কুলার ইত্যাদি : খামারের অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈদ্যুতিক দোহক-যন্ত্র (মিলকার), শীতলকারী যন্ত্র (কুলার) মাখন তোলা যন্ত্র (ক্রিম - সেপারেটর), ভোজ্যদ্রব্য পেষক যন্ত্র (ফিডগ্রাইন্ডার) ইত্যাদি যন্ত্র বেশি কার্যকর।

সেলফ বাইন্ডার, কম্বাইন হারভেস্টার : সেলফ বাইন্ডার বা স্বয়ং বন্ধনকারী যন্ত্র ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে আঁটি বাঁধে। তবে ফসল কাটার যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কম্বাইন হারভেস্টার। যন্ত্রটি একই সঙ্গে ফসল কাটে এবং ঝাড়াই-মাড়াই করে।

কৃষিপদ্ধতি ও পশুপালন : বিজ্ঞানের অবদানে খামারজাত ফসলে এবং সেখানে উৎপাদিত জীবজন্তুর আকৃতিতে এসেছে বিশাল পরিবর্তন। বহু শতাব্দী ধরে কৃষিকার্যে এবং গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রজননে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফসল উৎপাদনে ও পশুপালনে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে।

গবাদিপশু উৎপাদনে বৈচিত্র : যে ঘোড়া মাল টানবে আর যে ব্যবহৃত হবে দ্রুত ছোটোর কাজে, তাদের প্রজননপদ্ধতি আজ আলাদা। গবাদিপশুর প্রজননেও এসেছে বৈচিত্র। কোথাও ভালো মাংসের দিকে নজর রেখে, আবার কোথাও বেশি

দু*ধ উৎপাদনের কথা ভেবে প্রজনন এবং লালন-পালনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শস্য ও ফলমূল : শস্য ও ফলমূল উৎপাদনে বিজ্ঞান অভূত কল্যাণ সাধন করেছে। বীজ নির্বাচনে সতর্কতা, নতুন ও উন্নত ধরনের গাছপালার প্রজনন ব্যবস্থা এবং বীজ অংকুর ও গাছের কলম ব্যবহারের নতুন নতুন ব্যবস্থা কৃষিকাজে বিপ্লব এনেছে।

অতীতের উন্নত জাতি ও তাদের কৃষিকাজ : ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অতীতের উন্নত জাতিগুলো কৃষি কাজও উন্নত ছিল। প্রাচীন মিশরবাসি পালাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাষ জানতো। কৃত্তিম জলসেচন পদ্ধতির সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল। এমনকি কৃত্তিম উপায়ে ডিম ফোটানোর কার্যক্রমও তাদের অজানা ছিল না। এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন উন্নত জাতীয় বিভিন্নভাবে কৃষিকার্যে পারদর্শী ছিল।

প্রকৃত উন্নতির কাল : কৃষিকার্যে প্রকৃত যুগান্তর সূচিত হয় আঠারো শতক থেকে। শালগমজাতীয় সমূল উদ্ভিদের চাষ এ পর্বেই শুরু হয়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট রেকওয়েল কৃত্তিম প্রজনন পদ্ধতির রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তখনের সময় থেকেই খামারে পশুপালনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। কৃষিকাজ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিকায়নের ফলে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

উপসংহার : বিজ্ঞান সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। কৃষিক্ষেত্রেও তার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বাংলাদেশ হলো কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের উন্নতির মাধ্যমেই আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব। এজন্য আমরা যদি বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হই, তবে আমরা পেতে পারি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।